অধ্যায় ৬

উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব

অধ্যায় ৬ উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

☑ সাধারণ পর্যবেক্ষণযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং মিল-অমিলের ভিত্তিতে জীবজগতের বিভিন্ন ভাগ; যেমন: অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী

☑ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সাধারণ তুলনামূলক আলোচনা

৬.১ উদ্ভিদ

জীব জগতের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য উদ্ভিদ। শুধু খাবারের উৎস হিসেবেই নয়, বরং পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য উদ্ভিদ অপরিহার্য। উদ্ভিদ অনেক রকমের হয়, কিন্তু সকল উদ্ভিদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমাদের এ পৃথিবী সব জায়গা একই রকম নয়। এর কোথাও আছে সমভূমি, কোথাও আছে মরুভূমি, কোথাও আবার গিরিমালা। এখানে রয়েছে নদীনালা, খালবিল, হাওড়-বাঁওড় ইত্যাদি। আমাদের এই চিরচেনা বিশাল পৃথিবীকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে নানা আকার, আকৃতি ও বর্ণের গাছ পালা। সমুদ্রের গভীরে যেমন রয়েছে উদ্ভিদ, তেমনি সুউচ্চ গিরিমালাতেও পাওয়া যায় এর অবস্থান। আবহমানকাল থেকে পৃথিবীতে জীবনের যে বিচিত্র প্রবাহ চলে আসছে, তার মূলে রয়েছে সবুজ উদ্ভিদের বিরাট অবদান।

৬.১.১ উদ্ভিদজগতের বৈচিত্র্য

উদ্ভিদগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একে অপর থেকে ভিন্ন। এ কারণে উদ্ভিদ জগতের বৈচিত্র্যও অনেক বেশি। এ সকল উদ্ভিদের প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদাভাবে জানা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই বিশাল উদ্ভিদ জগতকে সহজ উপায়ে জানার জন্য এদেরকে নানান দলে বা শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

বর্ষজীবী উদ্ভিদ

ধান, মটর, ছোলা, কলা এসব আমাদের অতি পরিচিত উদ্ভিদ। এরা এক বছর অবধি বেঁচে থাকে। এজন্য এদেরকে একবর্ষী উদ্ভিদ বলা হয়। আবার যে সকল উদ্ভিদের জীবনকাল দুই বছর, যেমন: মূলা, গাজর, ফুলকপি এরা দ্বিবর্ষী উদ্ভিদ নামে পরিচিত। অন্যদিকে আমাদের চারপাশে কিছু কিছু উদ্ভিদ দেখতে পাই যারা বহু বছর বেঁচে থাকে, যেমন: আম, কাঁঠাল, তাল ইত্যাদি। এদেরকে বহুবর্ষী উদ্ভিদ বলে। উদ্ভিদের এই শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে কোন উদ্ভিদ কত বছর বাঁচে তার ভিত্তিতে।

বীরুৎ, গুল্ম ও বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ

বিভিন্ন জীবনকালের উদ্ভিদের পাশাপাশি এদের আকার আকৃতির মধ্যেও অনেক ভিন্নতা দেখতে পাবে। যেমন কিছু উদ্ভিদ দেখবে যারা লতানো হয়, আবার কিছু আছে নরম গঠনের হয় কিন্তু লতানো নয়। এর পাশাপাশি শক্ত কাণ্ডবিশিষ্ট ও লম্বায় অনেক উদ্ভিদ ও দেখতে পাবে। এরকম ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ জগতকে বীরুৎ (ছোট, নরম উদ্ভিদ যেমন: ধান, সরিষা, মরিচ), গুল্ম (ছোট গাছ যেমন ডালিম, হাসনাহেনা, কামিনী) এবং বৃক্ষ (কাষ্ঠল বড় গাছ, শাল, সেগুন, তাল) এ তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ সাধারণত কাষ্ঠলজাতীয়, সুউচ্চ কাণ্ডবিশিষ্ট হয়ে থাকে। অপরদিকে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদে সাধারণত নমনীয় বহুকাণ্ড দেখা যায় এবং বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ নরম কাণ্ডবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

সপুষ্পক ও অপুষ্পক উদ্ভিদ

আমাদের উদ্ভিদরাজি অসংখ্য বৈচিত্র্যের আধার। অনেক উদ্ভিদ আছে যারা ফুল বহন করে আবার অনেক উদ্ভিদ ফুল ছাড়াই জীবনকাল অতিবাহিত করে। ফুলের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদকে সপুষ্পক ও অপুষ্পক এই দুই দলে ভাগ করা হয়েছে। যে সকল উদ্ভিদে ফুল হয়, যেমন: আম, জাম, ধান, নারিকেল এরা সপুষ্পক উদ্ভিদ। অপরদিকে মস, ফার্ন ইত্যাদি যাদের ফুল হয় না, এরা অপুষ্পক উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত। ফুলের উপস্থিতি উদ্ভিদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ফুলের জন্যই পরাগায়ন সহজতর হয়, যা উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

অপুষ্পক উদ্ভিদ ফার্ন

পরভোজী উদ্ভিদ ইন্ডিয়ান পাইপ

স্বভোজী ও পরভোজী উদ্ভিদ

দেহের পুষ্টি সাধনের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদকে স্বভোজী ও পরভোজী এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। আমাদের চেনা সব সবুজ উদ্ভিদের কোষে ক্লোরোফিল নামক রঞ্জক থাকায় এরা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিজের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারে। এরাই হলো স্বভোজী উদ্ভিদ। অন্যদিকে স্বর্ণলতা, ঘোস্ট প্ল্যান্ট বা ইন্ডিয়ান পাইপ ইত্যাদি উদ্ভিদে ক্লোরোফিল না থাকায় এরা নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না এবং অন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল, তাই এরা পরভোজী উদ্ভিদ।

৬.১.২ উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি

সকল জীবেরই প্রজনন ঘটে। প্রজনন হলো বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমেই একই প্রজাতির নতুন নতুন বংশধর সৃষ্টি হয়। প্রজনন বিভিন্নভাবে হতে পারে। যৌন প্রজননে ভিন্ন ভিন্ন পুং ও স্ত্রী জননকোষের মিলনের নতুন সদস্য তৈরি হয়। আবার, অযৌন প্রজননে শুধু এক ধরনের কোষ থেকে নতুন বংশধর তৈরি হয়। কোনো কোনো উদ্ভিদ, প্রাণী কিংবা অণুজীবে উভয় ধরনের প্রজনন দেখা যায়।

বীজযুক্ত উদ্ভিদ

বীজ হলো উদ্ভিদের জীবনচক্রে তৈরি এমন একটি গঠন যা নতুন চারা গাছের জন্ম দিতে পারে। বীজে খাদ্য জমা থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে বীজ থেকে নতুন গাছ বেড়ে ওঠে।

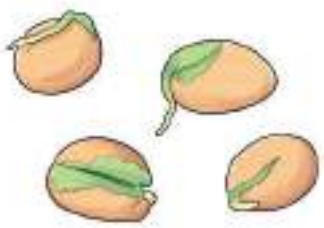

ছবি: কাঁঠালের বিচি

কখনো কী ভেবে দেখেছ বীজ কীভাবে তৈরি হয়? বীজযুক্ত গাছের যৌন প্রজনন ঘটে থাকে, এখানে গাছের পুংজনন কোষ বা পরাগরেণুর (pollen) স্ত্রী জনন কোষের ডিম্বাণুর (egg cell) সাথে মিলন ঘটে। ফুলের পুংকেশরের পরাগধানীতে পরাগরেণু আর গর্ভদণ্ডের নিচে গর্ভাশয়ে ডিম্বাণুর সৃষ্টি হয়। পরাগধানী থেকে পরাগরেণু বাতাস, মৌমাছি কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে ফুলের মাধ্যমে গর্ভমুণ্ডে যায়, এই প্রক্রিয়াকে

ছবি: নিষেক

পরাগায়ন (pollination) বলে। যখন একই ফুলের কিংবা একই গাছের ভিন্ন ফুলের মধ্যে পরাগায়ন ঘটে তাকে স্ব-পরাগায়ন বলে। আবার ভিন্ন গাছের ফুলের মধ্যে পরাগায়ন ঘটলে তাকে পর-পরাগায়ন বলে।

পরাগরেণু এসে পরাগমুণ্ডে পতিত হলে পরাগনালিকার সৃষ্টি হয়। এই নালিকা বেয়ে পরাগরেণু নিচে গর্ভাশয়ের দিকে যেতে থাকে। একসময় সেটি গর্ভাশয়ে থাকা ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়। এই মিলন প্রক্রিয়াকে নিষেক (fertilization) বলে, এবং নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ফল এবং বীজ তৈরি হয়।

বীজহীন ফলের উদ্ভিদ

কিছু কিছু উদ্ভিদের ফলে বীজ তৈরি হয় না। এসব ক্ষেত্রে স্পোরের (spore) মাধ্যমে গাছের বংশবৃদ্ধি ঘটে, এই ধরনের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে উদ্ভিদের অযৌন বংশবৃদ্ধির উদাহরণ। স্পোর হলো এক বিশেষ ধরনের ছোট কোষ। উদ্ভিদের যেই অংশে স্পোর সৃষ্টি হয় তাকে স্পোর ক্যাপসুল (spore capsule) বলে।

বীজের ভিন্নতা

বীজের আবরণ থাকা এবং না থাকার উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদকে আবৃতবীজী (angiosperm) ও অনাবৃতবীজী (gymnosperm)- এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিস্তার ফুলের উপর নির্ভরশীল হলেও অনাবৃতবীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সেটি নয়। অনাবৃতবীজী উদ্ভিদের বীজ সাধারণত একটা শক্ত আবরণের ভেতরে থাকে যাকে কোন (cone) বলা হয়, উদাহরণ হিসেবে পাইন গাছের কোনের কথা বলা যেতে পারে। অনাবৃতবীজী উদ্ভিদ হলো প্রাচীনতম উদ্ভিদ। যখন পৃথিবীতে ডাইনোসর ছিল, তখন স্থলজ উদ্ভিদের মধ্যে অনাবৃতবীজী উদ্ভিদ ছিল প্রধান। প্রায় ২৫০ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে এই উদ্ভিদগুলোর আবির্ভাব হয়েছে। সেই তুলনায় আবৃতবীজী উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে প্রায় ১০০ মিলিয়ন বছর আগে।

৬.২. প্রাণী

তোমার কি কোনো পোষা প্রাণী আছে? যদি নাও থেকে থাকে, তারপরেও নিশ্চয়ই কত রকম প্রাণী দেখেছ, একটু ভেবে বলোল দেখি, কোন প্রাণীটি তোমার প্রিয়, কেন প্রিয়? তুমি যেসব প্রাণী দেখেছ তাদের ভেতর পার্থক্যগুলো কি চোখে পড়ে?

৬.২.১ মেরুদণ্ডী প্রাণী

পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তাদের ভেতর রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। যেমন—তোমার পোষা বিড়ালটির একটা শক্ত শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড রয়েছে। তোমারও পিঠের মাঝ বরাবর একটি মেরুদণ্ড রয়েছে, যা তোমাকে

সোজা হয়ে চলতে সহযোগিতা করে। আবার অনেক প্রাণী আছে যাদের মেরুদণ্ড নেই—যেমন কেঁচো। নিশ্চয়ই দেখে থাকবে কেঁচো কীভাবে বুকে ভর দিয়ে চলে। কাজেই সব প্রাণীকে প্রথমেই আমরা মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা হচ্ছে সেসব প্রাণী যাদের শরীরে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত একটি মেরুদণ্ড থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। জলে-স্থলে থাকা এমনকি সমুদ্রের বৃহত্তম প্রাণীরাও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিভাগ

মেরুদণ্ডী প্রাণী হলো মেরুরজ্জু (nerve cord) যুক্ত প্রাণী। এটি তাদের পিঠ বরাবর নিচের দিকে নেমে আসে। এসব প্রাণী মূলত কর্ডাটা নামে পরিচিত। মেরুদণ্ড এই মেরুরজ্জুকে রক্ষা করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সুরক্ষা এবং চলাচলের জন্য শরীরের ভেতর অন্তঃকঙ্কাল (endoskeleton) থাকে। এই অন্তঃকঙ্কাল হাড় (bones) ও তরুণাস্থি (cartilage) দিয়ে তৈরি। তরুণাস্থি হলো নরম, হাড়ের মতো উপাদান যা প্রাণীর সাথে বৃদ্ধি পায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে রয়েছে সরীসৃপ, উভচর, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী। বিভিন্ন ধরনের মাছ মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিগুলোকে পরিপূর্ণ করে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সাতটি শ্রেণি

১) চোয়ালবিহীন মাছ
প্রায় ৭০টি মাছের প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যাদের চোয়াল নেই। এদের মাঝে হ্যাগফিশ ও ল্যাম্প্রে অন্যতম। ফুলকাযুক্ত এসব মাছের কঙ্কাল অত্যন্ত নমনীয় হয়।

২) অস্থিযুক্ত মাছ
প্রায় ২০,০০০ প্রজাতির মাছ আছে যাদের সুগঠিত কঙ্কাল থাকে, যার গঠন অস্থির মতো। শক্ত অস্থিবিশিষ্ট কঙ্কালের এসব মাছ শ্বসনের জন্য ফুলকা ব্যবহার করে। এই শ্রেণির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো রুই, ইলিশ ইত্যাদি।

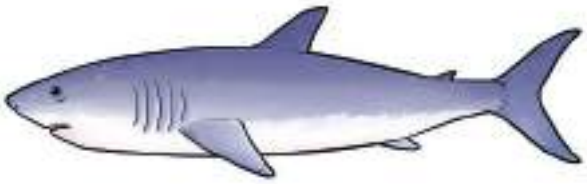

৩) তরুণাস্থিযুক্ত মাছ
কোমল তরুণাস্থি নিয়ে স্টিং রে, করাত মাছ ও নানা জাতের হাঙরের কঙ্কাল গঠিত হয়। এদেরও শ্বসনের জন্য সুগঠিত ফুলকা থাকে। তরুণাস্থিযুক্ত মাছের প্রায় ৭৫০টি প্রজাতি রয়েছে।

৪) উভচর প্রাণী

জল ও স্থল উভয় পরিবেশে বসবাস করার জন্য উভচর প্রাণীদের বিশেষ দেহ গঠন থাকে। তরুণ বয়সে এরা পানিতে থাকার সময় ফুলকা দিয়ে শ্বসন কাজ চালালেও পরিণত বয়সে স্থলে বাস করার সময় ফুসফুস দিয়ে চালায়। এসব প্রাণীর শক্ত চোয়াল, মসৃণ ত্বক ও অস্থিযুক্ত কঙ্কাল থাকে। প্রায় ৪৭০০ প্রজাতির উভচর প্রাণীর মধ্যে ব্যাঙ, স্যালামেন্ডার বহুল পরিচিত।

৫) সরীসৃপ

সরীসৃপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা বুকে ভর দিয়ে চলাফেরা করে। টিকটিকি, গিরগিটি, কুমির, কচ্ছপ, সাপসহ প্রায় ৮০০০ প্রজাতির সরীসৃপ পাওয়া যায়। কিছু সরীসৃপ জলে বাস করে। আবার কিছু স্থলে বাস করে। এদের সুগঠিত ফুসফুস থাকে। আঁশযুক্ত ত্বকের আবরণে শক্ত অস্থিযুক্ত কঙ্কাল থাকে।

৬) পাখি

প্রায় ৯৭০০ প্রজাতির পাখি পাওয়া গিয়েছে। পালকযুক্ত ডানার সাহায্যে অধিকাংশ পাখিই উড়তে পারে, ব্যতিক্রম উটপাখি। ফাঁপা অস্থিযুক্ত কঙ্কালের জন্য পাখিরা বেশ হালকা হয়। পাখিদের ফুসফুস থাকে। আমাদের অতিপরিচিত পাখিদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো কাক, চড়ুই, কবুতর, দোয়েল, ঈগল প্রভৃতি।

৭) স্তন্যপায়ী

মানুষ, কুকুর, বিড়াল, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভালুক, জলহস্তীসহ বেশিরভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণী স্থলে বাস করে। কিন্তু তিমি স্তন্যপায়ী হয়েও সমুদ্রে থাকে। স্তন্যপায়ীরা শিশুকালে মায়ের দুধ পান করে। এরা সবচেয়ে উন্নত বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী হলো চার পা (tetrapod) বিশিষ্ট, যেমন: গরু, ছাগল, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি, কিছু দুই পা (bipod) বিশিষ্ট, যেমন— মানুষ। স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহ লোমশ হয়। অস্থিযুক্ত কঙ্কাল এদের দেহ গঠন করে। সুগঠিত চোয়ালের জন্য এরা নানা ধরনের খাবার খেতে পারে। এ পর্যন্ত প্রায় ৪৭০০টি স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে।

৬.২.২ অমেরুদণ্ডী প্রাণী

সহজ ভাবে বলা যায়—যে প্রাণীদের মেরুদণ্ড থাকে না তারাই অমেরুদণ্ডী প্রাণী। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সকল পরিবেশে পাওয়া গেলেও এদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, সমস্ত প্রাণীর ৯৫ শতাংশেরও বেশি অমেরুদণ্ডী প্রাণী। অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা নানা পরিবেশে বাস করে। মরুভূমিতে, সমুদ্রের তলদেশে এবং এমনকি অন্যান্য জীবের ভিতরেও এদের পাওয়া যায়। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের নানা শ্রেণিতে ভাগ করা

যায়, এদের মাঝে আর্থ্রোপড (Arthropod) হলো অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৃহত্তম দল, যাদের ১২ লক্ষেরও বেশি প্রজাতি রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে কীটপতঙ্গ, মাকড়সা, কাঁকড়া, চিংড়ি, প্রভৃতি।

আর্থ্রোপড

আর্থ্রোপডের বহিঃকঙ্কাল (exoskeleton) শক্ত প্রকৃতির এবং সেটি অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকে রক্ষায় কাজ করে। বহিঃকঙ্কাল প্রাণীর বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায় না কাজেই প্রাণীর বেড়ে ওঠার সাথে সাথে এটিকে অবশ্যই দেহ থেকে মুক্ত করে দিতে হয়। আর্থ্রোপডদেরও সন্ধিযুক্ত পা থাকে যা তাদের চলাফেরা করতে সাহায্য করে। তাদের দেহ কয়েকটি বিশেষ খণ্ডে বিভক্ত থাকে। আর্থ্রোপডের তিনটি বৃহত্তম দল হলো ক্রাস্টাসিয়ান (Crustaceans), কীটপতঙ্গ (Insects) এবং অ্যারাকনিড (Arachnids)।

ক্রাস্টাসিয়ান

কাঁকড়া, চিংড়ি এবং লবস্টার ক্রাস্টাসিয়ানের উদাহরণ। ক্রাস্টাসিয়ানদের ৩০,০০০ টিরও বেশি পরিচিত প্রজাতি রয়েছে। সমুদ্রে এদের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া গেলেও ক্রাস্টাসিয়ানরা মিঠা জল, নোনা জল এমনকি মাটিতেও বাস করে।

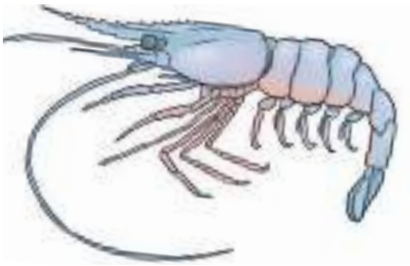

কীটপতঙ্গ বা ইনসেক্ট

আর্থ্রোপডের বৃহত্তম দল হলো কীটপতঙ্গ; পিঁপড়া, তেলাপোকা কিংবা মশা মাছি হচ্ছে এদের উদাহরণ। আর্থ্রোপডের মধ্যে ১০ লক্ষেরও বেশি প্রজাতি রয়েছে, তার মধ্যে বড় অংশই কীটপতঙ্গ। কীটপতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীরা মস্তিষ্ক, বক্ষ এবং উদর এই ৩টি খণ্ডে বিভক্ত থাকে। তিন জোড়া পা এদের বক্ষের সাথে যুক্ত থাকে। অ্যান্টেনা এবং চোখ কীটপতঙ্গকে তার আশপাশের পরিবেশ বুঝতে সাহায্য করে।

অ্যারাকনিড

মাকড়সা কিংবা বিছা হচ্ছে অ্যারাকনিডের উদাহরণ। এদের চার জোড়া পা এবং একটি বা দুটি দেহ খণ্ড আছে। এদের কোনো অ্যান্টেনা নেই। মাকড়সা এক ধরনের শিকারি প্রাণী যারা প্রধানত কীটপতঙ্গ খাওয়ার উপর নির্ভরশীল। সকল মাকড়সা শক্তিশালী রেশম ফাইবার উৎপাদন করে। কিছু মাকড়সা এই রেশমের জাল বুনে শিকার ধরে থাকে।

আর্থোপড ছাড়া আরও নানা ধরনের অমেরুদণ্ডী প্রাণী আছে। যেমন আমাদের পরিচিত প্রাণীদের মাঝে কেঁচো কিংবা জোঁক অচ্ছে এনালিডা (Annelids) শ্রেণির, জেলিফিশ এবং প্রবাল হচ্ছে নিডারিয়া (Cnidaria) শ্রেণির। ঝিনুক, শামুক কিংবা অক্টোপাস হচ্ছে মলাস্কা (Mullusk) শ্রেণীর অমেরুদণ্ডী প্রাণী। পরবর্তী শ্রেণিতে তোমরা এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানবে।

৬.৩ অণুজীব

খালি চোখে দেখা যায়না এমন জীবন্ত বস্তু হলো অণুজীব। অণুজীবগুলো এককোষী হতে পারে অর্থাৎ যাদের শুধু একটি কোষ আছে। কিছু অণুজীব বহুকোষী, যার একাধিক কোষ থাকে। অণুজীবদের জন্য খাদ্য, বায়ু, পানি, বর্জ্য নিষ্পত্তির উপায় এবং তারা বসবাস করতে পারে এমন পরিবেশ প্রয়োজন। কিছু অণুজীব উৎপাদক (producer) অর্থাৎ সূর্যালোক ব্যবহার করে সরল পদার্থ থেকে নিজেদের খাদ্য তৈরি করে (উদ্ভিদের মতো)। কিছু অণুজীব পরজীবী বা ভোক্তা (consumer), যারা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না এবং খাদ্যের জন্য অন্যান্য জীবের উপর নির্ভরশীল। বেশিরভাগ অণুজীব রোগ সৃষ্টি করে না বরং অনেক অণুজীব জীবনের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। অণুজীব বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের মতোই অণুজীবদের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। এই শ্রেণিবিন্যাসগুলো অণুজীবের আকার, গঠন, খাদ্যের উৎস, বাসস্থান, এবং চলাচল দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই অণুজীবের মধ্যে রয়েছে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং প্রোটিস্ট। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ছত্রাক এবং প্রোটিস্ট যেরকম এককোষী হতে পারে ঠিক সেরকম বহুকোষী এমনকি আকারে যথেষ্ট বড় হতে পারে। অর্থাৎ, ছত্রাক বা প্রোটিস্ট মাত্রই যে সাধারণ অণুজীবের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খালি চোখে দেখা যায় না এমনটা নয়। এদের সম্পর্কে একটু পরেই আমরা আরেকটু বিশদভাবে জানব। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং প্রোটিস্ট ছাড়াও ভাইরাস নামে এক ধরনের অণুজীব রয়েছে যেগুলোর আসলে স্বাধীন জীবন নেই।

৬.৩.১ ব্যাকটেরিয়া

ব্যাকটেরিয়া হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় এবং সুপ্রচুর জীবগোষ্ঠী। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে জানত না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অ্যান্টোনি ভন লিউয়েনহুক, একজন ডাচ বণিক তাঁর দাঁতের স্ক্র্যাপিং পর্যবেক্ষণ করতে একটি সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্র (মাইক্রোস্কোপ) ব্যবহার করেছিলেন। লিউয়েন হুক জানতেন না যে, তিনি যে ক্ষুদ্র জীবগুলি দেখেছিলেন তা আসলে ব্যাকটেরিয়া। ২০০ বছর পর প্রমাণিত হয়েছিল যে ব্যাকটেরিয়ারও জীবন রয়েছে। ব্যাকটেরিয়া প্রায় সকল পরিবেশে

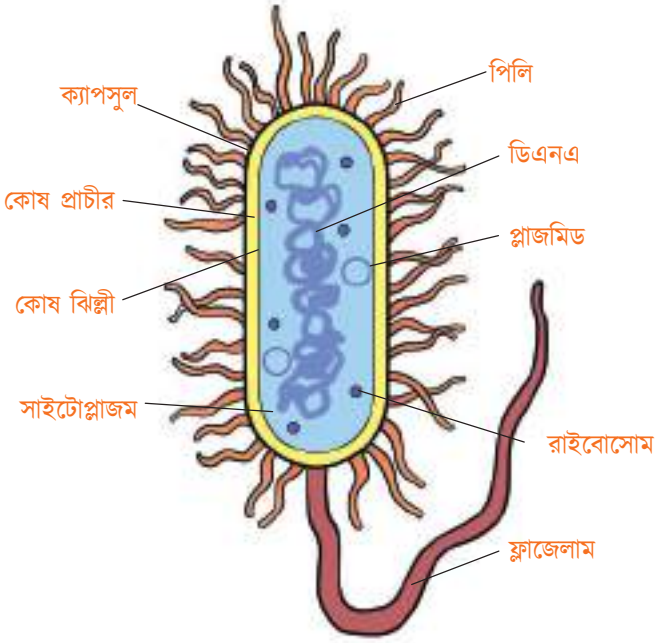

ছবি: ব্যাকটেরিয়া

বাস করে। এদের সমুদ্র, মাটি, পৃথিবী পৃষ্ঠের নিচে গভীর শিলায়, প্রাণীদেহে এমনকি মানুষের অন্ত্রেও পাওয়া যায়। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার প্রজাতি এমনকি উষ্ণ প্রস্রবণ, সমুদ্রের তলদেশ, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ কিংবা অতি লবণাক্ত পরিবেশ—এই ধরনের প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে। জীবাণুমুক্ত করা হয়নি এমন যে কোনো পৃষ্ঠ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আবৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবীতে মোট ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা অবিশ্বাস্য, অনুমান করা হয় এই সংখ্যা পাঁচ মিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন (পাঁচের পর ত্রিশটি শূন্য)! তুমি কি জান তোমার দেহের কোষের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাকটেরিয়া তোমার দেহে বসবাস করে?

ব্যাকটেরিয়া একটি নির্দিষ্ট আকার পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তারপর দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়ায় প্রজনন করে। তখন একটি মাতৃকোষ বিভক্ত হয়ে দুটি অভিন্ন অপত্যকোষ তৈরি হয়। এর ফলে খুব দ্রুত ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আদর্শ পরিবেশে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা প্রতি ২০ মিনিটে দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। এই ধরনের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি একটি অস্থিতিশীল পরিবেশেও ব্যাকটেরিয়াকে টিকে থাকতে সহায়তা করে।

ব্যাকটেরিয়া অনেক ধরনের হয়, কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য ও অক্সিজেন তৈরি করতে পারে; কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া আবার পরভোজী, খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল। আকৃতির দিক দিয়ে দেখলেও ব্যাকটেরিয়া নানা ধরনের হয়, যেমন: রড, গোলাকার বা সর্পিল আকৃতির।

৬.৩.২ ছত্রাক

ছত্রাক বলতেই আমাদের সবচেয়ে পরিচিত যে উদাহরণ মনে পড়ে তা হচ্ছে ব্যাঙের ছাতা। এর বাইরেও রুটি বাসি হওয়ার পরে এর উপরে যে নীলাভ সবুজ ছত্রাক জন্মায় সেটাও আমাদের সবারই চেনা। তবে ছত্রাকের এসব প্রজাতি খালি চোখে দেখতে পেলেও অধিকাংশ ছত্রাকই এত ক্ষুদ্র যে তাদের মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না। সেজন্য ছত্রাক সাধারণত অণুজীব হিসেবে বিবেচিত হয়।

ছত্রাক ফানজাই (Fungi) রাজ্যের অন্তর্গত জীব (একবচন: ফাঙ্গাস)। তাদের ক্লোরোফিল নেই তাই সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না এবং শোষণের (absorption)

মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করে। বেশিরভাগ ছত্রাক বহুকোষী, তবে কিছু এককোষী হিসেবে বিদ্যমান।

ছত্রাকের প্রায় ১৫ লক্ষ প্রজাতি রয়েছে। ছত্রাক নানা পরিবেশে বাস করে—যেমন, মাটির গভীরে, ক্ষয়প্রাপ্ত গাছের গুঁড়ির নিচে বা গাছপালা এমনকি প্রাণীর ভিতরে যেখানে এদের সহজে দেখা যায় না। কিছু ছত্রাক আবার অন্য ছত্রাকের ভেতরে বা তার উপরেও বসবাস করতে পারে।

ছত্রাক আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেক প্রজাতি মানুষের জন্য উপকারী। আমাদের পরিবেশের জন্য ছত্রাক খুব প্রয়োজন। ছত্রাক বিভিন্ন পদার্থকে পচিয়ে তা থেকে পুষ্টি উৎপাদন এবং অন্যান্য জীবের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি করতে সাহায্য করে।

ছবি: ছত্রাক

৬.৩.৩ প্রোটিস্ট

প্রোটিস্টরা সুকেন্দ্রিক বা ইউক্যারিয়টিক কোষের একটি অতি বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় শ্রেণি—তোমরা জানো, যে কোষের কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস থাকে তাদের সুকেন্দ্রিক কোষ বলে। প্রোটিস্টরা গঠনগতভাবে একে অপরের থেকে খুব আলাদা, কোনোটি অ্যামিবার মতো ক্ষুদ্র ও এককোষী, আবার কোনোটি সামুদ্রিক শৈবালের মতো বড় এবং বহুকোষী। যেসব সুকেন্দ্রিক জীব এই প্রোটিস্টা রাজ্যটি তৈরি করে, অন্যান্য রাজ্যের প্রাণীদের সাথে তাদের খুব বেশি মিল নেই। কোনো কোনো প্রোটিস্ট প্রাণীর মতো খাবার খোঁজে, কোনো কোনটি উদ্ভিদের মতো সালোকসংশ্লেষণ করে আবার কোনো কোনটি ছত্রাকের মত পরভোজী। এত মিল থাকার পরেও প্রোটিস্টকে সরাসরি প্রাণী, উদ্ভিদ কিংবা ছত্রাক কোনো শ্রেণিতেই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

প্রাণীসদৃশ প্রোটিস্ট:

কিছু কিছু প্রাণীসদৃশ প্রোটিস্ট তাদের কোষের পৃষ্ঠদেশ প্রসারিত করে পায়ের মত কাঠামো তৈরি করে প্রাণীর মত চলাফেরা করে, এদেরকে সুডোপডস (Pseudopods) বলে। সিলিয়েট (Ciliate) নামে প্রোটিস্ট কোষপৃষ্ঠের সিলিয়া নামের ছোট ছোট চুলের মত অংশকে নাড়িয়ে স্থান পরিবর্তন করে। আবার ফ্ল্যাজেলেট (Flagellate) নামে কিছু কিছু প্রাণী-সদৃশ প্রোটিস্ট পশ্চাৎদেশের অপেক্ষাকৃত লম্বা চুলের মত একটি ফ্লাজিলাকে পাখার মত ঘুরিয়ে চলাচল করে।

ছবিতে তিন ধরেনের প্রাণী সদৃশ প্রোটিস্ট: সুডোপডস, সিলিয়েট ও ফ্ল্যাজেলেট

উদ্ভিদসদৃশ প্রোটিস্ট:

এরা শৈবাল নামে পরিচিত, আকারে বড় এবং বৈচিত্র্যময় একটি শ্রেণি। এরা এককোষী বা বহুকোষী হতে পারে। উদ্ভিদের মতো এদের কাণ্ড, মূল বা পাতা নেই, কিন্তু এরা উদ্ভিদের মতো সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে শর্করা তৈরি করতে পারে একই সাথে প্রাণীদের শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন তৈরি করে। বেশিরভাগ উদ্ভিদসদৃশ প্রোটিস্টরা সমুদ্র, পুকুর বা হ্রদে বাস করে।

সামুদ্রিক শৈবাল এবং কেল্প (kelp) বহুকোষী, উদ্ভিদসদৃশ প্রোটিস্টের উদাহরণ। কেল্প আকারে উদ্ভিদের মতো বড় হয়ে সমুদ্রে একটি 'অরণ্য' তৈরি করে ফেলতে পারে। এ ধরনের প্রোটিস্ট বাস্তুতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য এবং সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খলের ভিত্তি।

ছত্রাকসদৃশ প্রোটিস্ট:

ছত্রাকসদৃশ প্রোটিস্টগুলোর সাথে ছত্রাকের অনেক বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে। তারা উভয়েই পরভোজী, খাদ্যের জন্য তারা অন্য জীবের উপর নির্ভরশীল। ছত্রাকের মতো এদের কোষেও কোষ প্রাচীরের উপস্থিতি থাকে এবং এরাও স্পোর ব্যবহার করে প্রজননে অংশ নেয়। ছত্রাকসদৃশ প্রোটিস্টের দুটি উদাহরণ হলো, স্লাইম মোল্ড এবং জলীয় মোল্ড।

শৈবাল কেন উদ্ভিদ নয়?

ক্লোরোপ্লাস্টের উপস্থিতি এবং সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকার জন্য সাধারণভাবে অনেকসময় আমরা শৈবালকে উদ্ভিদ ভেবে থাকি। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায়, শৈবালে প্রকৃত উদ্ভিদ কোষের অনেক কিছুই থাকে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শৈবালের মূল, কাণ্ড বা পাতা নেই। কিছু শৈবাল দেখা যায়, যারা আবার চলাফেরা করতে সক্ষম। এরা সুডোপড (pseudopod) বা ফ্ল্যাজেলার (flagella) সাহায্যে চলাফেরা করতে পারে, যা উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য নয়। যদিও শৈবাল নিজেরা উদ্ভিদ না; এরা সম্ভবত উদ্ভিদের পূর্বপুরুষ ছিল।

৬.৩.৪ ভাইরাস

আমরা সবাই এখন SARs-CoV-2 ভাইরাস সম্পর্কে জানি, যেটি COVID-19 এর কারণ। ভাইরাস মূলত প্রোটিন আবরণে মোড়ানো, ডিএনএ (DNA) কিংবা আরএনএ (RNA) নামে জেনেটিক বস্তু। এসব অতিক্ষুদ্র জীবের কেউ কেউ আমাদের বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টির কারণ। আমাদের অতি

পরিচিত রোগ সর্দি-কাশির পেছনেও ভাইরাস দায়ী। যেহেতু ভাইরাসের কোনো কোষ নেই তাই অন্য কোষের মতো এদের কোনো কোষ ঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম কিংবা রাইবোসোম নেই।

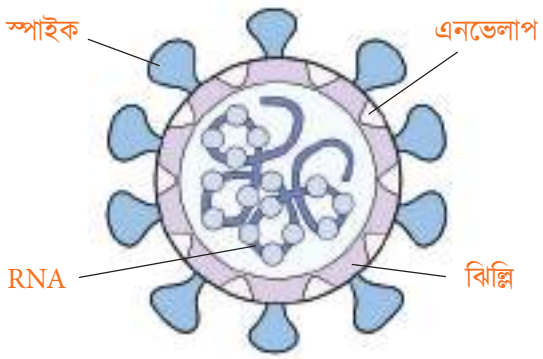

ছবি: SARs-CoV-2 ভাইরাস

এখন প্রশ্ন হলো, ভাইরাস কি জীবিত? আমরা জানি সমস্ত জীবের কোষ থাকে; সেই সাথে তারা প্রজননেও সক্ষম। কিন্তু ভাইরাস নিজেরা প্রজনন করতে পারে না। ভাইরাস এমন একটি সত্তা যা অন্য একটি জীবের কোষকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত কোষগুলিকে পোষক (host) কোষ বলা হয়। জীবকোষে একবার ভাইরাস ঢুকে গেলে, সেটি কোষে তার সংখ্যাবৃদ্ধির নির্দেশ দেয়। ভাইরাসের জেনেটিক বস্তুর নির্দেশে জীবকোষ অসংখ্য ভাইরাসের প্রতিলিপি তৈরি করে। তারপর কোষটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা ফেটে যায় এবং ভাইরাসগুলি মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি নতুন ভাইরাস তখন একটি নতুন পোষক কোষ দখল করতে পারে। এভাবে পোষক কোষ একদিনেই ১০ বিলিয়ন পর্যন্ত অনুরূপ ভাইরাস তৈরি করতে পারে। ভেবে দেখো, ভাইরাস যদি একটি মুদ্রার সমান হতো তাহলে একদিনে তৈরি ১০ বিলিয়ন ভাইরাস পুরো একটা ফুটবল মাঠকে ১ মিটারের বেশি (৩ ফুট) গভীরতায় ভরে ফেলতে পারতো।

ঠিক এই কারণে, বেশিরভাগ বিজ্ঞানী ভাইরাসকে জীবন্ত বস্তু বলে মনে করেন না।

অনুশীলনী ?

১। একটি ব্যাকটেরিয়া যদি ২০ মিনিটে দ্বিগুণ হয়ে যায় তাহলে ৬ ঘণ্টায় তাদের মোট সংখ্যা কত হবে?

২। মানুষ ছাড়া আর কোন কোন প্রাণী দুই পায়ে হাঁটে বলো দেখি?

৩। খাবার কিছুদিন ফেলে রাখলে, কিংবা ফ্রিজে অনেক বাসী খাবার রয়ে গেলে তার উপর যে সাদাটে ধূসর তুলোর মতো আস্তর পড়ে খেয়াল করেছ? এগুলো আসলে কী বলতে পারো?